একজন পদার্থবিদের দৃষ্টিতে বিবর্তনবাদ

ডারউইনিজমের আতঙ্ক

মুলঃ ড. ভিকটর স্টেংগার, আনুবাদঃ বন্যা আহমেদ

[বিজ্ঞানী ভিকটর স্টেংগার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি ‘কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স’ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্ত-মনার একজন সম্মানিত সদস্য। ড. স্টেংগর Timeless Reality, The unconscious Quantum, Physics and Psychics, and Not by design সহ অনেক সুলিখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের প্রনেতা। নীচের প্রবন্ধটি অধ্যাপক স্টেংগারের অনুমতিক্রমে তার সর্বশেষ বই 'Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe' এর একটি অধ্যায় থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদটি দৈনিক সংবাদ আর ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।]

‘আমাদের চারপাশে র বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন অশুভ কিংবা শুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুনাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না’

- রিচার্ড ডকিন্স, (জীববিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির Public Understanding of Science বিভাগের অধ্যাপক)।

সরলতার বিপদ:

বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে যে, যুগে যুগে বিজ্ঞান তার পুরনো তত্ত্বগুলোকে আবর্জনার স্তুপে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন তত্ত্বকে সাদরে গ্রহন করে নেয় এবং এভাবে ক্রমাগতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পদার্থবিদ এবং চিন্তাবিদ থমাস কূন, তার বহুলপাঠ্য ’The structure of Scientific Revolution' বইয়ে প্রথম এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার বদৌলতেই আজকে এই 'paradigm shift' কথাটি আমাদের নিত্যদিনের শব্দভান্ডারের অংশ হয়ে গেছে। ‘বিজ্ঞান আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে’ - এই ধারণাটি আসলে একধরনের অতিরঞ্জন বৈ আর কিছু নয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পদার্থবিদ স্টিভেন ওয়েনবার্গ এর মতে, বিজ্ঞানের ইতিহাস খুঁজলে

থমাস কূনের বলা এই ব্যাপক 'Paradigm Shift' এর উদাহরণ খুবই কম দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ পরিবর্তনই ক্রমানুয়িকভাবে আস্তে আস্তে ঘটে এবং নতুন তত্ত্ব আবিস্কারের পরেও অনেকদিন ধরে পুরনো তত্ত্বগুলো ব্যবহৃত হতে থাকে, নতুন আবিস্কারগুলো পুরনোগুলোকে হটিয়ে বিদায় করে না দিয়ে বরং নিজেরাই নতুন পরিসরে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, যদিও প্রায় এক শতাব্দী আগেই কোয়ান্টাম বিপ্লব নিউটনিয় তত্ত্বকে আপাতঃভাবে 'ভুল' বলে প্রমান করেছিলো, পদার্থবিদ্যা পাঠ্যক্রমের বেশিরভাগ জুড়েই এখনও চিরায়ত নিউটনিয় মতবাদই আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে । ওয়েনবার্গ এর মতে এমনকি তাঁর সহকর্মী থমাস কূনও, হাভার্ড এ তাঁর ছাত্রদেরকে ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যাই শিক্ষা দিতেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা চিরায়ত ক্ষেত্রকে (classical domain) কেন্দ্র করে কাজ করে এবং পারমানবিক, আন্তঃপারমানবিক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও এর অনন্য কার্যকরীতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু নিউটনীয় বলবিদ্যা যে সময় বিকশিত হয়েছিল সে সময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রমাণ করার মত কোন উপাত্ত বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না।

তবে গত পাঁচ শতাব্দীতে অন্তত পক্ষে দুটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকে বড় paradigm shift হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ; (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের আবিস্কৃত তত্ত্ব- পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) চার্লস ডারউইন এবং এ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস এর প্রস্তাবিত প্রকল্প - প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন। এই দুটি আবিস্কার শুধু যে মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল তাই নয় তারা তখনকার প্রাচীন এবং গভীরভাবে সুরক্ষিত চিন্তাপদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে পুরানো ধারণাগুলোর উপরও আধিপত্যও বিস্তার করে নিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তত্ত্ব দুটোই পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রাচীন চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আঘাত করেছিলো - যেগুলোকে মানুষ এতদিন ধরে সৃষ্টিকর্তার অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতো। এই দুই তত্ত্বকেই সেই সময়ে খ্রীস্টান ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি এক প্রাণঘাতী ভীতি হিশেবে গণ্য করা হয়েছিল।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক বিবর্তনবাদ তত্ত্ব ডারউইনের প্রস্তাবিত প্রাথমিক ধারণার পরে , বিশেষ করে মৌলিক ডি.এন.এ কে কেন্দ্র করে আনবিক কার্যপ্রণালী আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আবার কারও কারও মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বাইরেও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদ্ধতিও বিবর্তনে ভুমিকা রাখে। আমি এখানে 'ডারউইনিজম' বলতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের (natural process of chance and natural law) সমন্বয়ে ঘটা জৈবিক বিবর্তনকেই বুঝাচ্ছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান চার্চ গ্যলিলিওকে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব, যাকে গ্যালেলিও শুধুমাত্র একটি গণিত শাস্ত্রীয় মডেলই নয় বরং 'বাস্তব সত্য' হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, তা অস্বীকার করতে বাধ্য করিয়েছিল। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থে অত্যন্ত পরিস্কারভাবেই উল্লেখ আছে যে, পৃথিবী সৌরজগতের অনড় কেন্দ্র। chron. ১৬.৩০ তে উল্লেখ আছে, 'হ্যা পৃথিবী শক্তভাবে দাড়িয়ে আছে, কখনই নড়বে না...'। Ps ১০৪:৫ দৃঢ়তার সাথে বলে, 'তিনি পৃথিবীকে তার ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন, যাতে কোন দিনও একে নাড়নো না যায়।...' একই রকম আরও অনেক উক্তি দেখা যায় যেমন: Ps.৯৩:১ এবং ৯৬:১০ এ। তা সত্ত্বেও প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই কোপারনিকাসের সৌর-তত্ত্বের বিরুদ্ধে ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের সংগ্রাম ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। মূলতঃ কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে জোড়ালো সাক্ষী প্রমাণগুলোএমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যে, ধর্মকে হয় একসময় বাস্তব সত্য গ্রহণ করে নিতে হত না হয় ধ্বংস হয়ে যেতে হত। শেষ পর্যন্ত

বলতে গেলে, একধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়েই ধর্মকে মেনে নিতে হয় যে পৃথিবী আসলেই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এর ফলে গোড়া ধার্মিকেরাও এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে বাইবেলে লেখা সব কিছুকে সবসময় আক্ষরিক অর্থে মেনে নেওয়া যাবে না। এখান থেকেই ধর্মবাদী(Apologistic)দের পক্ষ থেকে নতুন জ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বাইবেলকে পুনর্ব্যখ্যার প্রয়াস শুরু হয়, তা বাইবেল-বিবৃত আক্ষরিক বাণীর সাথে সাদা চোখে যতই অসঙ্গতিপুর্ণ মনে হোক না কেন।

উনবিংশ শতাব্দী আসতে আসতে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে আসে, এবং সে কারণেই ডারউইনকে গ্যলিলিওর মত দুঃখজনক পরিনতির স্বীকার হতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ডারউইনকে তাঁর বর্ণিল জীবনের শেষে নিউটনের পাশে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়। তারপরও, চিন্তাবিদ ড্যনিয়েল ডেনেট ডারউইনের মতবাদটির নাম দিয়েছেন ‘ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব’; এটি ‘বিপজ্জনক‘ কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রানি, কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই, শুধমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণের থেকে ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে; আর সে কারণেই ডারউইনের এই তত্ত্বটি সেসময়ে খুব কম জায়গায়ই সাদরে গৃহীত হয়েছিল। আজও ডারউইনের এই বিপজ্জনক তত্ত্বটি বিজ্ঞান এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা :

সর্বসাধারণের মধ্যে বিবর্তনবাদ আসলেই বৈজ্ঞানিক কিনা এ নিয়েই বিতর্ক থাকলেও বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে আদৌ এমন কোন তর্ক-বিতর্কের নজীর পাওয়া যায় না, সেখানে বিতর্কযুদ্ধ চলে বিবর্তনবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খতা নিয়ে, কখনই মতবাদটির মৌলিক ব্যাপারগুলো নিয়ে নয়। ডারউইনের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিবর্তনবাদের সপক্ষে পরীক্ষা লব্ধ সাক্ষ্য প্রমাণের সংখ্যা হাজারগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি এবং গঠনের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ এতখানিই কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যে একে এখন জীববিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে গন্য করা হয়।

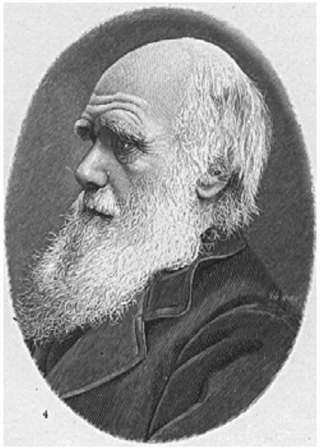
চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২)

ডারউইন যা জানতেন তার চেয়ে আমরা এখন অনেক অনেক বেশী জানি, এবং আজকে আমরা এই অগ্রসর জ্ঞানের আলোকে বিবর্তনবাদের মূল তত্ত্বের আমূল সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এখন জীন তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু এবং তাতে ডি.এন.এ কি ভূমিকা পালন করে তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝতে পেরেছি। এই সকল আবিস্কারই বিবর্তনবাদের মূল মতবাদকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে। আজকে আমরা জিনের ভিতরেই বিভিন্ন প্রাণের মধ্যে বিদ্যমান নিবিড় সম্পর্ক এবং তাদের সাধারণ উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

আমি যখন এই বইটি লিখছিলাম তখনই মানুষের জিনোম প্রজেকটের ফলাফল প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত যত প্রাণীর জিনোম পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে পাওয়া পরিচিত ডি.এন.এ র অনুক্রমগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, সকল জীব একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে- ঠিক যেমনটি ডারউইন বলেছিলেন। ল্যাবরেটরিতে ব্যকটেরিয়া, ফ্রুট ফ্লাই, এবং অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন আমারা চোখের সামানেই দেখেছি। চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণায় বিবর্তন একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচিত হয়। আজকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব থেকে পাওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

কোন কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক কিনা তা বিচারের মানদন্ড নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু নিচের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, বিবর্তনবাদ যে বিজ্ঞান' তা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। এখানে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ (emperical observation) নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষণযোগ্য এমন ভবিষদ্বানী (testable predictions) করা হয় যা ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিশেষ করে, ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলে তা খুব সহজেই ভুল প্রমানিত হয়ে যেত।

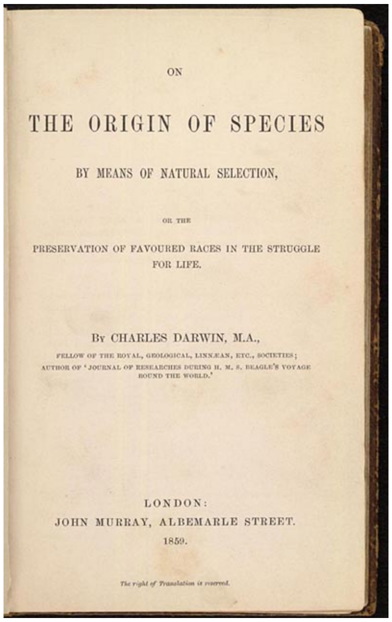

The Origin of Species
by Means of Natural Selection
by Charles Darwin

ডারউইন এবং ওয়ালেসের সময়, বেশীর ভাগ মানুষ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বাস করতো যে, ৬ হাজার বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ঠিক এই সময়েই ভূতত্ত্ববিদরা প্রমাণ পেতে শুরু করেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে তার থেকে অনেক বেশী এবং এই নতুন তথ্যটি ডারউইনকে এতই আলোড়িত করেছিলো যে তিনি বিগেলের সমুদ্রযাত্রার সময় চার্লস লিয়েলের লেখা 'ভূতত্ত্বের মূলনীতি' বইটি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'On the Origin of the Species by means of Natural Selection' বইটির প্রথম সংস্করণে ডারউইন, ভূতত্ত্ব থেকে পাওয়া জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, সাধারণ একটি অনুমান করেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে কয়েক'শ কোটি বছর। সেখান থেকেই তিনি দেখান, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটা এবং তার মাধ্যমে বহু প্রজাতির জীব সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে লম্বা সময়ের দরকার তা আমাদের এই পৃথিবীর আছে।

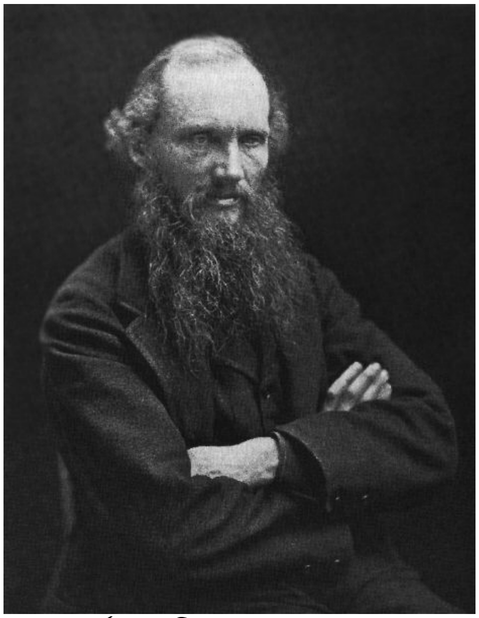

লর্ড কেলভিন (১৮২৪-১৯০৭)

বিখ্যাত পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন (যিনি পরে লর্ড কেলভিন উপাধিতে ভূষিত হন) এই আনুমানের বিরোধিতা করে বলেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে ডারউইন যা বলেছেন তার থেকে অনেক কম। থমসন থার্মো-ডাইনামিকসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তিনিই প্রথম থার্মো-ডাইনামিকসের দ্বিতীয় সুত্র এবং চরম তাপমাত্রা স্কেল আবিষ্কার করেন। থমসনের সময় বিজ্ঞানীরা সৌর রশ্মির বিকিরণে অবদান রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস হিসেবে শুধুমাত্র রাসায়নিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের কথাই জানতেন। থমসন দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আলাদা আলাদাভাবে সূর্যের বয়স নির্ধারণ করে দেখান, মাধ্যাকর্ষণ বল ব্যবহার করলে সূর্যের বয়স সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় এবং সেটাও কিনা হচ্ছে মাত্র কয়েক'শ লক্ষ বছর। থারমো-ডাইনামিকসের সুত্র ব্যবহার করে কেলভিন এটাও প্রমাণ করেন যে, এমনকি মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর তাপমাত্রা এতই বেশী ছিল যে সেখানে কোনরকম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

ডারউইনের সময়কালে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে যা জানতেন তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা সম্পর্কে বড় ধরণের সন্দেহের জন্ম দেয়। ডারউইন বিবর্তনবাদ তত্ত্বের আরেক আবিষ্কারক ওয়ালেসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই, পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে থমসনের দৃষ্টিভংগী আমার সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।' থমসনের সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হত তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনতত্ত্ব তখনি ভুল প্রমানিত হয়ে যেত। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ প্রসঙ্গে থমসনের সিদ্ধান্তই আসলে ভুল ছিল এবং সে কারণেই ডারউইনের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ যায়নি। কিন্তু থমসনকেও এখানে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, তিনি সেই সময়ের জানা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর, বিংশ শতাব্দীতে নতুন আরেকটি শক্তির উৎস হিসেবে পারমানবিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল যে এটি রাসায়নিক বা মাধ্যাকর্ষন শক্তির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। এর ফলে সূর্যের বয়স নিখুঁতভাবে হিসেব করার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য একটি পরিমাপক খুঁজে পাওয়া গেল। আরো দেখা গেল যে, থমসন পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে আসার ক্ষেত্রে সময়ের হারের যে হিসেব করেছিলেন তা সম্পুর্ণই ভুল কারণ পৃথিবী প্রাকৃতিক পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী তাপ উৎপাদন করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে বিজ্ঞানীরা বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন যে পারমানবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যের ভিতরকার তাপের সৃষ্টি হয় । এই শতাব্দির শেষ নাগাদ সূর্য হতে প্রাপ্ত নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণ করার (এমন একটি পরীক্ষায় আমি নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলাম) মাধ্যমে সূর্যের শক্তির উৎস হিসেবে পারমানবিক শক্তির যথার্থতা আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় এবং সূর্যের সম্ভাব্য বয়সও হিসেব করে বের করা হয় প্রায় একশ কোটি বছর। এর আগেই রেডিওঅ্যাকটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে যে পৃথিবীর বয়স আসলেই কয়েক শ কোটি বছর, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরাও প্রায় কাছাকাছি সময়কালের

মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণের খোঁজ পেয়েছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, বিবর্তনবাদ অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতই একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ, এবং বিজ্ঞান কাজ করে উন্মুক্ত সীমায়, কাজেই কেউ দিব্যি দিয়ে বলতে পারে না ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোথায় কি পরিবর্তন করতে হবে। তবে এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বর্ণিত বিবরতনবাদতত্ত্বকে ভবিষ্যতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে (অন্ততপক্ষে একটি ব্যাপক পরিসরে) বললে, ভবিষ্যতে পৃথিবী আবার সমতল প্রমাণিত হবে বলার মতই শোনাবে।